কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়

বিজয়গড় জ্যোতিষ রায় কলেজ

বাংলা সম্মানিক,পর্ব – ৪

দশম পত্র,মডিউল –১

বিষয়- কমলাকান্তের দপ্তর –বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

প্রসঙ্গ –হাস্যরস

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের 'কমলাকান্তের দপ্তর' প্রবন্ধ গ্রন্থটি ব্যক্তিগত প্রবন্ধের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। অলংকার শাস্ত্রের নব রসের ধারায় হাস্য রস অন্যতম। প্রাচীন ও মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে যা প্রাধান্য পেয়েছিল – তা মূলত আদি রস। কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্রের লেখনীতে সেই হাস্যরস পরিশীলিত ও মার্জিত হয়ে ওঠে। কারণ সংস্কৃত সাহিত্য ও প্রাচীন বাংলা সাহিত্যের উত্তরাধিকার হিসেবে যে হাস্যরসের ধারাটি পেয়েছিলেন বঙ্কিমচন্দ্র ,তার সাথে তিনি যুক্ত করেছিলেন ইউরোপীয় সাহিত্য জাত হাস্যরসের বোধ। পাশ্চাত্য সাহিত্য সমালোচকগণ হাস্য রসকে প্রধানত চারটি শ্রেণীতে বিভক্ত করেন – ফার্স, উইট, স্যাটায়ার এবং হিউমার। হটস হল তরল নির্দোষ রসিকতা যাতে অন্যকে বিদ্রুপ করা নেই ,নেই চোখের জলের আভাস। উইট হল বুদ্ধিদীপ্ত হাস্যরস কথার কৌশলে বুদ্ধির প্রয়োগে এজাতীয় হাস্যরস সৃষ্টি হয়ে থাকে। স্যাটায়ার হল তীব্র বিদ্রুপ ,সমাজ অথবা ব্যক্তির দোষ ত্রুটিকে নির্মমভাবে আঘাত করা হয় এই জাতীয় হাস্যরসে। সমাজ অথবা ব্যক্তির দোষ ত্রুটিকে নির্মমভাবে আঘাত করা হয় এখানে। হাসির বিচারে হিউমার হলো সর্বশ্রেষ্ঠ হাস্যরস। হাসি ও কান্নার সমানুপাতে এর সৃষ্টি । যাকে নিয়ে হাসছি তার জন্য অন্ত:সলিলা সহানুভূতি যখন হৃদয়কে আর্দ্র করে ,তখন হিউমারের জন্ম হয়। হাসি ও কান্নার নিখুঁত মিশ্রণে গড়ে ওঠে হিউমারের অসঙ্গতি যেন সার্কাসের ব্যালেন্সের খেলার মত। একটি সরু দড়ির উপর দাঁড়িয়ে আছে। একদিকে বেশি হেললে হাসি উচ্ছ্বসিত হবে ,অপরদিকে বেশী ফেললে অশ্রু গড়িয়ে পড়বে।

কমলাকান্তের দপ্তর গ্রন্থে হাস্যরসের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ।কারণ বঙ্কিমচন্দ্র বহু কাল গম্ভীর প্রবন্ধ রচনার মাধ্যমে পাঠকবর্গকে নিয়োজিত রেখেছেন। তো সেই সঙ্গে অনুধাবন করেছেন গুরু মশাইয়ের ভঙ্গিতে না বলে ,পাঠকের স্তরে নেমে এসে বন্ধুর মতো সহজ ভঙ্গিতে কথা বললে ভাবনাগুলিকে অনেক সার্থকভাবে অপরের মনে সঞ্চারিত করা যায়। এই কারণেই তিনি ব্যক্তিগত প্রবন্ধের ভঙ্গিতে কমলাকান্তের দপ্তর রচনা করেন ব্যক্তিগত প্রবন্ধের মূল সুর হলো আড্ডার সুর এবং আড্ডায় হাসির উপস্থিতি অনিবার্য।

আমরা জানি ব্যক্তিগত প্রবন্ধ ব্যক্তিত্বের দর্পণ ।কমলাকান্ত জানেন তিনি একা বলেই নিরানন্দ, কিন্তু জানেন না কেন তিনি নিজেকে আনন্দ সমুদ্রে মিলাতে পারেন নি ,জানেন না কেন তিনি একা ,তবু বন্ধু ভাবে পাঠককে জানান "কেহ একা থাকিও না। যদি অন্য কেহ তোমার প্রণয়ভাগী না হইল তবে তোমার মনুষ্য জন্ম বৃথা ।পুষ্প আপনার জন্য ফুটে না, পরের জন্য তোমার হৃদয় কুসুমকে প্রস্ফুটিত করিও ।"প্রাবন্ধিক বঙ্কিম এখানে গুরুর আসনে বসে নেই, আর সেই কারণেই বন্ধুত্বপূর্ণ বার্তাটি অনায়াসে পাঠকের কাছে পৌঁছে দিতে পেরেছেন। সমাজ সচেতন বঙ্কিম সারা জীবনে গুরুগম্ভীর প্রবন্ধের মাধ্যমে যা পাঠক মনে গেঁথে দিতে পারেননি তা অনেক সহজে পেরেছেন কমলাকান্তের দপ্তরে। নিঃসঙ্গ কমলাকান্ত প্রকৃতপক্ষে সংসার রসের রসিক। যে সমস্ত মানুষ শতপাকে সংসারে জড়িয়ে আছে তাদের পক্ষেই প্রকৃত সংসার রসিক হওয়া বেশ কঠিন। কিন্তু কমলাকান্ত যেন সামান্য দূর থেকে নৈর্ব্যক্তিক ভঙ্গিতে এই সংসারের নাট্যশালা দর্শন করছেন ।তাই তিনি সংসারের চূড়ান্ত নৈরাশ্যজনক অবস্থার মধ্যেও যে গম্ভীর আনন্দঘন রস রয়েছে তা উপলব্ধি করতে পেরেছেন।

কমলাকান্তের মনে হয়েছে "মনুষ্য মাত্রই পতঙ্গ ।সকলেরই এক একটি বহ্নি আছে। সকলেই সেই বহ্নিতে পুড়িয়া মরিতে চাহে। সকলেই মনে করে সেই বহ্নিতে পুড়িয়া মরিতে তাহার অধিকার আছে ।.....জ্ঞান-বহ্নি , ধন-বহ্নি,মান-বহ্নি, রূপ -বহ্নি,ধর্ম্ম -বহ্নি,ইন্দ্রিয়-বহ্নি, সংসার বহ্নিময়।"জীবনের সংজ্ঞা যদি হয় 'অনন্ত যন্ত্রণাময় অন্বেষণ' তাহলে সাহিত্যের সংজ্ঞা হবে 'অনন্ত যন্তনার ইতিহাস'। পতঙ্গ প্রবন্ধে বলতে চাইলেন মানুষের সামনে দুটি পথ খোলা আছে ।হয় পুড়ে মরা, নয় ফিরে যাওয়া ।হয় তত্ব জিজ্ঞাসায় ঝাঁপ দেওয়া ,নয়তো তত্ব জিজ্ঞাসা থেকে দূরে থাকা। কমলাকান্ত দুটি পথই পাঠকের সামনে খোলা রেখেছেন কোন পথটাই জোর করে চাপিয়ে দেননি।

'আমার মন 'প্রবন্ধে বঙ্কিমচন্দ্র হাস্যরস সৃষ্টিতে সচেষ্ট হয়েছেন। যেখানে কমলাকান্ত তার হারানো মন সন্ধান করতে গিয়ে পাকশালায় ,প্রসন্নর গোয়ালে এবং পথচলতি যুবতীর কাছে গেছেন। পাঠশালায় অনুসন্ধান উপলক্ষে কমলাকান্ত যে হাস্যরস সৃষ্টি করেছেন তা সংস্কৃত নাটকের বিদুষকের ভোজনপ্রিয়তাকে মনে করিয়ে দেয়। উদাহরণ দিলে বিষয়টি স্পষ্ট হবে -

"একজন বন্ধু বলিলেন ,দেখ, পাকশালা খুঁজিয়া দেখ, সেখানে তোমার মন পড়িয়া থাকিতে পারে। মানি, পাকের ঘরে আমার মন পড়িয়া থাকিতো। যেখানে পোলাও কাবাব কোপ্তার সুগন্ধ ,যেখানে ডেকচি-সমারূঢ়া অন্নপূর্ণার মৃদু মৃদু ফুট ফুট বুটবুট- টকবকোধ্বনী, সেইখানে আমার মন পড়িয়া থাকিত।..... যেখানে পাচকরুপী বিষ্ণু কর্তৃক লুচিরুপ সুদর্শন চক্র পরিত্যক্ত হয় ,আমার মন সেইখানেই গিয়া বিষ্ণুভক্ত হইয়া দাঁড়ায় ।অথবা যে আকাশে লুচি চন্দের উদয় হয় ,সেইখানেই আমার মন- রাহু গিয়া তাহাকে গ্রাস করিয়া গ্রাস করিতে চায়।অন্যে যাহাকে বলে বলুক আমি লুচিকেই অখন্ড মন্ডলাকার বলিয়া থাকি।"এখানে ভোজন ললুপতার মত লঘু বিষয়ের সঙ্গে গুরুগম্ভীর ভাষা ও গুরু গম্ভীর পৌরাণিক উপমার বৈপরীত্যের অসঙ্গতি তৈরি করে হাস্য রস সৃষ্টি করেছেন কমলাকান্ত।

কমলাকান্তের দপ্তরে হিউমার জাতীয় হাস্যরস থাকলেও উইট ও স্যাটায়ারের- এর প্রাধান্য লক্ষ্য করা যায় ।কারণ সমাজ সচেতনতা ,অন্যায় অসহিষ্ণু বঙ্কিমচন্দ্র শাসক গোষ্ঠীর আচরণ ও পরাধীন দেশবাসীর অক্ষমতা অজ্ঞানতা ও কুসংস্কারে ক্ষুব্ধ না হয়ে পারেননি। সেই ক্ষোভের সরাসরি প্রকাশ ব্যাঙ্গের চাবুকে স্যাটায়ারের মাধ্যমে প্রকাশ করেছেন।

সাধারণভাবে মানব চরিত্রে অসংগতিমূলক আচরণ আরোপ করে এই দপ্তরে হাস্যরস সৃষ্টির চেষ্টা করা হয়েছে ।যেমন 'বসন্তের কোকিল' ও 'বিড়াল 'প্রবন্ধ এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। 'মনুষ্য ফল' প্রবন্ধের ধনিপুত্রশোষণকারী, সুযোগসন্ধানী, মনুষ্য চরিত্র, এ প্রসঙ্গে স্মরণীয় ।যাদের কমলাকান্ত মাছি ও পিপড়ার সঙ্গে উপমিত করেছেন ।ধরা যাক 'বিড়াল' প্রবন্ধে বিড়াল মানুষের তেলা মাথায় তেল দেওয়ার প্রবণতাকে ব্যঙ্গ করে বলে-" দেখ, যদি অমুক শিরোমনি কি অমুক ন্যায়ালঙ্কার, আসিয়া তোমার দুধটুকু খাইয়া যাইতেন ,তবে তুমি কি তাঁহাকে ঠেঙ্গা লইয়া মারিতে আসিতে? বরং যোড় হাত করিয়া বলিতে ,আর একটু আনিয়া দিব?..... তেলা মাথায় তেল দেওয়া মনুষ্যজাতির রোগ ।"

বস্তুত সমাজ শিক্ষক বঙ্কিমচন্দ্র উনিশ শতকের নবজাগ্রতবাঙ্গালীদের সচেতন করবার জন্যই এইরকম হাস্যরসধর্মী অনন্য গ্রন্থ রচনায় প্রয়াসী হয়েছেন। সমাজ ,রাজনীতি, কুসংস্কার বিভিন্ন বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণের জন্যই তিনি নেশাখোর, চালচুলাহীন কমলাকান্ত চরিত্র সৃষ্টি করলেন ।আর সবমিলিয়ে 'কমলাকান্তের দপ্তর' হয়ে উঠল বাংলা সাহিত্যের এক অনন্য সৃষ্টি।

কমলাকান্তের দপ্তর গ্রন্থের মূল সুর হল -

"বাইরে যবে হাসির ছটা ভেতরে রবে চোখের জল।"

আর এই বিষয়ে প্রাবন্ধিক বঙ্কিম সর্বতভাবে সফল একথা বলার অপেক্ষা রাখে না।

সহায়ক গ্রন্থ:-

- চিন্তা নায়ক বঙ্কিমচন্দ্র- ভবতোষ দত্ত
- বঙ্কিমচন্দ্রের সাহিত্য জিজ্ঞাসা - বিষ্ণুপদ ভট্টাচার্য
- বঙ্কিম মানুষ - অরবিন্দ পোদ্দার
- বঙ্কিমচন্দ্রের কমলাকান্তের দপ্তর- সম্পাদনায় ড.ইন্দ্রানী চক্রবর্তী।